International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 56-72
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণে যতীন্দ্রমোহন বাগচী: 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধের নিরিখে পাঠ বিশ্লেষণ

রাজেশ খান
এম. ফিল ছাত্র, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ,

Abstract

Jatindramohan Bagchi is a contemporary poet of Rabindranath Tagore. In the practice of Bengali Literature-Society-Arts-Culture, Jatindramohan Bagchi's literary contribution is absolutely necessary for study. His literature has gained prominence in the context of environmental conditions, regional factors, local history, daily domestic life, diverse rural life and living conditions. Therefore, the knowledge of the local art and cultural history of that region (Jamsherpur in Nadia district) is essential to study of Jatindramohan Bagchi's literature. He lived in the city for most of his life but he was also found of rural heritage. He was aware of local heritage and country's history. In his essay 'Palli-Katha', there is an indication of that in the article: 'In the actual history of the country, rural history is also necessary.' He highlighted the history, culture and tradition of the zamindari of Jamsherpur in Nadia and adjoining areas (Karimpur, Shikarpur, Dhoradaha, Sundalpur, Arabpur etc.) while describing the rural history in his writings. The formulas have come up in the description of the natural ingredients of rural history. The oldest place, archaeological patterns, the description of the ethnic elements, the Nil-Kuthi mentioned in his writings are well described. In his descriptions rural cultural history has been displayed of the traditional places of worship, the history of local festivities, the rural life and livelihood all are sketched by him. The contexts of local history, geographical and historical background of rural environments have also been included. In this article we have analysed the reflection of the elements of local history, culture and tradition in the article 'Palli-katha' of Jatindramohan Bagchi through content analysis.

Key Word: Local History, Tradition, Heritage, Rural Life, Folklore

১. ভূমিকা: বাংলা সাহিত্য-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস চর্চার ধারায় পল্লীকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যসম্ভারের চর্চা করা একান্তই জরুরি। তাঁর সাহিত্যে পরিবেশ পরিস্থিতি বা 'Context', আঞ্চলিক উপাদান,

আঞ্চলিক ইতিহাস, দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবন, বিচিত্র গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রণালী ইত্যাদির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁর সাহিত্য-কীর্তিতে প্রেক্ষাপট ও পটভূমি হিসাবে যে এলাকাগুলি স্থান পেয়েছে, সেই অঞ্চলের স্থানীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস জানতে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্য-কীর্তি চর্চা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জীবনের বেশিরভাগ সময় শহুরে জীবন-যাপন করলেও তাঁর জীবন আপাদ-মস্তক পল্লী ঐতিহ্যে মোড়া ছিল। গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ভীষণ আনুগত্য ছিল। দায়বদ্ধ ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি, দেশের ইতিহাসের প্রতি। তাঁর লেখা 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে তেমনটায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৬-১০৭): " দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, ... বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, ... তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লীকাহিনী হইলেও দুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে" – অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে জাতীয় ইতিহাস সৃজনে সহযোগী ইতিহাস হিসাবে আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গদর্শন পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন: 'বাংলার ইতিহাস চাই, নাহিলে কখন মানুষ হইবে না'। তিনি আরোও উল্লেখ করেন 'আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করি'। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে – বঙ্কিমচন্দ্রের এমন আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর রচনায় পল্লী ইতিহাস বর্ণনকালে নদীয়ার করিমপুর এবং তদ্‌সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার (করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোড়াঁদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর ইত্যিদি) জমিদারী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। সেই সূত্রধরেই উঠে এসেছে পল্লী ইতিহাস নির্মাণের সজীব উপাদানের বর্ণনা। তাঁর রচিত প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে প্রাচীনতম স্থানের নাম, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোচনা, জাতিতাত্ত্বিক উপাদান বর্ণন, শোষকযন্ত্র নীলকুঠির আত্মকথা ইত্যাদি দিকগুলি। গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত নির্মাণকালে ধরা পড়েছে বর্ণিতব্য এলাকার ঐতিহ্যাশ্রয়ী পূজা-পাল-পার্বণ, স্থানীয় উৎসবাদি-মেলার ইতিহাস কথা, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ইত্যাদির কথা। স্থানীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণন, আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিন্নপাঠ হিসাবে, স্থানীয় ভূগোলের ইতিহাস (History of Regional Geography) রচনা করেছেন, যাকে ইতিহাসচর্চার নবপাঠ (New Text) বলা যায়। স্থানীয় ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক পল্লীজনের মুখের ভাষা ও ভাষার ব্যবহারগত দিক এবং উক্ত এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি (Education and Culture) – এই দিকটিও বাদ পড়েনি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সাহিত্যালোচনায়। ইতিহাস অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ সূত্রে, তাঁর 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধের নিরিখে, আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণের সঙ্গে অন্বিত আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি।

২. ইতিহাস লিখনে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যর ভূমিকা এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ইতিহাস চিন্তন: পল্লীগ্রাম বা গ্রামীণ এলাকা অনেক অজানা রত্নের সন্ধান দেয়। এই সকল উৎসসমূহ একদিকে আমাদের ঐতিহ্যগত উপাদান হিসাবে সাক্ষ্য বহন করছে, অন্যদিকে এই উপাদান সমূহই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে লুপ্ত রত্নোদ্ধারের মতই নানাবিধ উপাদানের খোঁজ পাই। এই সকল উপাদানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর ইতিহাস চিন্তনের সুচিন্তিত মতামত জানা যায়। এবারে আমরা সেদিকেই আলোকপাত করবো। প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ্য; এই পর্বের আলোচনাকে দু'পর্যায়ে তুলে ধরা হবে। পর্যায় দু'টি হল:

২.১ ইতিহাস রচনার প্রামান্য উপাদান হিসাবে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যর ভূমিকা এবং

২.২ সাহিত্যে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদান : প্রসঙ্গত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ইতিহাস চিন্তন।

২.১ ইতিহাস রচনার প্রামান্য উপাদান হিসাবে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যর ভূমিকা: আমাদের এই পর্বের আলোচনায় যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী' শীর্ষক গ্রন্থটির কয়েকটি মন্তব্য ও উদ্ধৃতি সবিশেষ উল্লেখের

প্রয়োজন। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা অন্যতম আঞ্চলিক ইতিহাসকার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন (চৌধুরী, ২০০৮: ৪৮):

> "জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে। আঞ্চলিক বিবরণের সামগ্রিক বা সমষ্টিগত চিত্র আহরণ করতে সক্ষম হলে, যে জাতীয় ইতিহাস রচিত হবে, তদ্বারা দেশ বা জাতির প্রকৃত জনজীবনের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভবপর। প্রত্যেক অঞ্চলের একটা ইতিহাস আছে, একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে এবং জাতীয় জীবন থেকে আঞ্চলিক সত্ত্বা অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে পৃথক।"

- অনেকটা এই কথার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা 'পল্লী-কথা' (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৬-১০৭) প্রবন্ধে:

> "দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনার পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, ... বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনার এই সকল ক্ষুদ্র বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।"

ঐতিহাসিক টয়নবিও একই মত পোষণ করেছেন (চৌধুরী, ২০০৮: ৪৮):

> "জাতীয় ইতিহাস অনুশীলন করেত হলে ক্ষুদ্রতর বিভাগ বা এলাকাকে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।"

- পণ্ডিতগণের চিন্তা-ভাবনা ও বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় পর্যায়ের ইতিহাস আলোচনায় আঞ্চলিক উৎস সূত্রকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার আলোচনার অভিমুখ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন তাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে (চৌধুরী, ২০০৮: ৪৮):

> "আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় সাধারণত প্রস্তাবিত এলাকার ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য উৎসের মূল অনুসন্ধানে উৎসাহিত হয়ে অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।"

- সেই সঙ্গে তিনি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ইতিহাসের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন (চৌধুরী, ২০০৮: ৪৮):

> "জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক গবেষণা ও ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা একজন বড় মাপের ঐতিহাসিকের কাজ। আঞ্চলিক বা স্থানীয় ঐতিহাসিক একই ধরনের কাজের জন্য আদিষ্ট হন। পার্থক্য হল এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্মধারা বৃহৎ এলাকা বা জাতীয় ইতিহাস রচনার মধ্যে পরিব্যপ্ত এবং অপরজনের কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট এলাকার ইতিহাস গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক ঐতিহাসিকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁরাও এক বিরাট ও মহান কর্মযজ্ঞের অংশীদার।"

- বেশিরভাগ সময় আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণেতাদের হীনার্থক-বাচকভাবে দেখা হয় বা তাঁদের কর্মপ্রয়াসকে বেশ তাচ্ছিলের সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়। এ বিষয়ে কিন্তু খুব সচেতনভাবেই সমালোচক ঘোষণা করেছেন: 'আঞ্চলিক ঐতিহাসিকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁরাও এক বিরাট ও মহান কর্মযজ্ঞের অংশীদার'। শ্রী চৌধুরী খুব

সংক্ষিপ্তাকারে জাতীয় ইতিহাস বা আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন (চৌধুরী, ২০০৮: ৫৪):

> "এর কেন্দ্রস্থলে আছে অঞ্চল বিশেষের মানবগোষ্ঠীর আশাআকাঙ্ক্ষা, দৈনন্দিন জীবন চর্যা, সমসাময়িক ঘটনাবলী, শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজবিন্যাস ও অর্থনৈতিক বন্ধনের একত্রীভূত রূপ এবং এই রূপটিকে তুলে ধরাই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।"

–বর্তমানে 'গ্লোবালাইজেসন' ধারণার সমান্তরালে 'লোকালাইজেসন' ধারণা যেভাবে সমাজবেত্তাদের আলোচনার টেবিল থেকে উঠে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতে এবং কালানুক্রনিক ইতিহাস চর্চার ধারায় 'আঞ্চলিক ইতিহাস' বা 'স্থানীয় ইতিহাস' চর্চা ভিন্ন মাত্রা পাবে। বলাবাহুল্য 'লোকালাইজেসন' ধারণায় অঞ্চল বা স্থানীয় বা গ্রামীণ পরিবেশকে নতুনভাবে দেখার তাগিদ দেখা দিয়েছে, যে ভাবনার মূলেই রয়েছে স্বজাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাংস্কৃতিক গরিমা এবং তার শিকড়কে জানার আকাঙ্ক্ষা। আর লোকসংস্কৃতি-চর্চার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ বাঙালির ভাবাবেগগত পরিচয় বা 'Emotional Identity' এবং বাংলা ও বাঙালির ঐ 'Emotional Pulse'- কে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় এই ধরনের চর্চায়, যা জাতির ইতিহাস পুর্নগঠনে (Rreconstruction of History) অনবদ্য কৌশল (Strategy)।

২.২ সাহিত্যে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদান : প্রসঙ্গত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ইতিহাস চিন্তন: সাহিত্যের আলোচনায় পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের নানাবিধ পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি, যা থেকে আমরা খুব সহজেই সেই অঞ্চলের সামগ্রিক বা আংশিক পরিচয় পেয়ে যায়। এর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানাবিধ সূত্র বা উপাদান। যখন সেই অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন এই ধরনের সাহিত্যিক উপাদানই আঞ্চলিক বা স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রধান আলম্বন হিসাবে বিবেচিত হয়। অবশ্য সাহিত্যিক ব্যবহৃত এইসব সাহিত্যিক উপাদানকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতকর্তার আশ্রয় নিতে হয়। কেননা আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ, তবে সেই দর্পণের সবটাই কিন্তু ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণীয় নয়। গ্রহণ-বর্জনের এই ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনাকারগণ তাঁদের পারদর্শিতা ও মৌলিকতার পরিচয় তুলে ধরেন।

আমরা জানি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদানের অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা। সাহিত্যিক উপাদান ভিত্তিক ইতিহাস নির্মাণের এই ধারা পণ্ডিত মহলে ব্যপকভাবে সমাদৃত। যেখানে ইতিহাস সচেতন মানুষ খুব কম বা বিভিন্ন কারণে সেইসব অঞ্চলের ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনা, সেইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের একমাত্র ভরসা এই ধরনের সাহিত্যিক উপাদান। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, সবটাই যে মূল্যবাণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্য বেশিরভাগটায় গ্রামীণ আবেশে রচিত, পল্লী-গ্রামের বহুবিধ চিন্তা-চেতনার আরশি তার রচনায় ব্যপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সে কারণেই স্বভাবতই তার বিভিন্ন রচনায় পল্লী ভাবনার বৈচিত্র্যময়ী রূপচিত্র ধারণ করে রয়েছে, যেখান থেকে আমরা স্থানীয় এলাকার আঞ্চলিক উপাদান, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পরিবেশ পরিস্থিতি বা 'Context', আঞ্চলিক ইতিহাস, বিচিত্র গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধের নিরিখে তাঁর ইতিহাস চিন্তন, বিশেষত স্থানীয় ইতিহাস ভাবনার পরিচয় পেতে পারি।

প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৬-১০৭):

> "অদ্য এই সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে যে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে যদি ঐতিহাসিকের কোন স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য সকলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যে ইচ্ছার বসবর্ত্তীতায় বর্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল জন্মভূমির প্রতি মমত্ব-বশতঃই সম্ভব হইতে পারে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনার পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, তাই আমরা এই প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনার এই সকল ক্ষুদ্র বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।"

–সুতরাং পল্লীকথা তথা পল্লী ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধের অবতারণা তা তাঁর বক্তব্যেই সমর্থন মেলে। তাছাড়া দেশের ইতিহাস-রচনায় পল্লীর ইতিহাসও যে প্রয়োজনীয় এবং প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যোগ্য সহায়ক সূত্র বা উপাদান হিসাবে কাজ করে তা তাঁর বক্তব্যেই ফুটে উঠেছে। এই প্রবন্ধের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাস চিন্তন ধরা পড়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

> ১. "সচরাচর পল্লীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারণত্ব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই যে ঐ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৭)
>
> ২. "… যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষের তথ্যে পূর্ণ বলিয়া স্থানীয় লোক ব্যতিরেকে অন্যের চিত্ত আকর্ষণের যোগ্য নহে, তথাপি এই ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লিকাহিনী হইলেও দুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে, এই আশায় ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৭)
>
> ৩. " প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হইতেছে না বা বিদেশীয় দস্যুবিশেষ দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায় নাই বলিয়া যে কোন শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশের সামান্য ইতিহাস ঐতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহ্য একথাও আমাদিগের মনে হয় না; কারণ ইতিহাস – ইতিহাস, আড়ম্বর নহে এবং দরিদ্রের ইতিহাসে দারিদ্র ভিন্ন কে কবে ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করে ?" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৭)

–সচরাচর আমরা একজন কবি হিসাবেই যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পরিচয় পেয়ে থাকি। কিন্তু 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধ পাঠশেষে আমাদের এই ধারণা ভ্রম বলে মনে হতে পারে। তিনি একজন কবি, পাশাপাশি তিনি যে কতটা ইতিহাস সচেতন – পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়ে পাঠকরা অবগত হন।

৩. যতীন্দ্রমোহন বাগচী সাহিত্যে স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণ: 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে পাঠ-বিশ্লেষণ: যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধ পাঠ শেষে আমরা নদীয়ার করিমপুর এবং তদ্‌সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী (করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোড়াঁদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর) এলাকার নানাবিধ ঐতিহ্যকথা, সংস্কৃতির খুঁটিনাটি জানতে পারি। জমিদার পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য-ইতিহাস, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা, বর্ণভিত্তিক আলোচনা, ঐতিহ্যাশ্রয়ী পূজা-পাল-পার্বণ, স্থানীয় উৎসবাদি এবং মেলার বর্ণনা, স্থানীয় ধর্মপাঠ, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও কৃষীকাজের বর্ণনা, প্রাচীনতম স্থানের নামোল্লেখ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্ণন ইত্যাদির সানুপঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য স্থানীয় ইতিহাস কাঠামোর সম্ভাব্য রূপরেখার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধটি হতে পারে আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্যতম উদাহরণ। আঞ্চলিক ইতিহাস সৃজনে কোন কোন দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং তা কী ভাবে জনপদবাচ্যকরে

তোলা সম্ভব তার সজীব উদাহরণ এই প্রবন্ধ। আলোচনার সুবিধার্থে এই পর্যায়ের আলোচনাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন-

৩.১ আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণে পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য: প্রেক্ষিত জমিদার পরিবার
৩.২ 'পল্লী-কথা'প্রবন্ধে ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা: আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিন্ন পাঠ
৩.৩ আঞ্চলিক ইতিহাস উৎস সন্ধানে : বর্ণভিত্তিক আলোচনা
৩.৪ প্রাচীনতম নামোল্লেখ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্ণন
৩.৫ যতীন্দ্রমোহন বাগচী কলমে স্থানীয় ধর্মপাঠ **(Local Religious Text):** স্বকীয় সংস্কৃতির আঁধার
৩.৬ গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও কৃষিকাজের বর্ণনা এবং
৩.৭ ঐতিহ্যাশ্রয়ী পূজা-পাল-পার্বণ, স্থানীয় উৎসবাদি এবং মেলার বর্ণনা: স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের **(Regional Cultural History)** অনন্য পাঠ।

–এবারে আমরা উপরিউক্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

৩.১ আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণে পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য: প্রেক্ষিত জমিদার পরিবার: আঞ্চলিক ইতিহাস সৃজনে উক্ত এলাকার প্রাচীন, বনেদী পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য, তাদের ইতিহাস সংকলন করার কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী পল্লীর ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে একাধিক জমিদার পরিবারের নাম উল্লেখ করেছেন। মেহেরপুর থানার অধীন প্রধান প্রধান গ্রামগুলির ইতিবৃত্ত নির্মাণ কালে, জমিদার পরিবারের কথা 'পেড়েছেন'। বাগচী বর্ণিত গ্রামগুলির মধ্যে একমাত্র করিমপুর বাদে যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোঁড়াদহ, সুন্দলপুর এবং আরবপুর - সব গ্রামেই জমিদারী শাসন ব্যবস্থা এবং জমিদার পরিবারের অস্তিত্বর কথা ধরা পড়ে। বলাবাহুল্য আঞ্চলিক ইতিহাস সৃজনে পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্য বহুলভাবে সাহায্য করে তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় (চৌধুরী, ২০০৮: ৫৫):

> "পারিবারিক, ধর্মস্থান ও প্রতিস্থানের ইতিহাস অনালোচিত না হলে বহু ঘটনা অজানা থেকে যায়। বঙ্গদেশে বিখ্যাত পরিবারগুলির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনজীবন ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে; যা জাতীয় বা সামগ্রিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশের কোন সুযোগ নেই।"

- এই প্রেক্ষিতে আমরা যতীন্দ্রমোহন বাগচী বর্ণিত 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন জমিদার পরিবারের কথা তুলে ধরতে পারি।

৩.১.১ বাগচী পরিবার : প্রাবন্ধিকের ভাষায় (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৬) - "যমশেরপুর ক্ষুদ্র পল্লী।...বাগচী বাবুরা এই গ্রামের জমিদার বংশ জাত।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- প্রাবন্ধিক যমশেরপুরে পল্লীবৃত্ত বর্ণন কালে আত্ম-অহমিকায় ডুবে যাননি। আবেগকে খুব করে সংযত রেখেছেন। স্ব বংশের ঐতিহ্য কথা বলতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন যথেষ্ট সচেতন। 'বাগচী বাবুরা' এই সম্মোধনসূচক শব্দযুগল নির্বাচনই তা প্রমাণ করে। কিছু বাড়িয়ে বলে পক্ষ্যপাতিত্বের বশে পরিবারকে পাইয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা বা আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনার আকাঙ্ক্ষায় তার উপস্থাপন নয়। সত্যি সত্যি মনের মধ্যে পল্লীকে জানান দেবার ইচ্ছায় - এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

যমশেরপুরের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তাঁর জন্মের প্রায় আট দশক আগের পারিবারের সদস্যদের কথা বলেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৬-১১৭)। পারিবারিক কথা তুলে ধরেছেন। বাগচী পরিবারের যমশেরপুর আগমন বৈবাহিক সূত্রে। যতীন্দ্রমোহনের পূর্ব পুরুষ রামভদ্র-বাগচী ১০৫১ সালে জমশেরপুরের পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দলপুরে আসেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার 'অন্তঃপাতী ধামসহ' গ্রামে। এরপর ১০৫৩ সালে জন্মভিটে এবং বসতভিটে দুটো'ই পরিত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে বসত ভিটা গড়েন জমসেরপুরে।

প্রাবন্ধিকের মতে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৭) সমকালে বাগচী পরিবারের বিস্তৃতি ছিল বহুদূর ব্যাপী এবং পরিবারের আত্মীয় পরিজনেরা ছিল তিনশতকেরও অধিক। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাগচী পরিবারের কৃতী সন্তান। রামগঙ্গা বাগচী এবং সর্বানন্দ বাগচী এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাগচী জমিদারীর যে ভূসম্পত্তি তা সবই রামগঙ্গা বাগচী কৃত। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৬-১১৭): 'তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন'। সাতটীকার মুহুরীগিরি থেকে মুর্শিদাবাদ নসীপুররাজের দেওয়ান হওয়া এবং পেশাগত দক্ষতার দৌলতে খ্যাতিবান ও প্রচুর ভূসম্পদের মালিক হন। সর্বানন্দ বাগচীও নায়েবিগিরি করে খ্যাতি সম্পন্ন হন। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাগচী পরিবারে বেশ কয়েকজন নায়েব, মুহুরিগিরি পেশার সাথে যুক্ত ছিল। পেশাগত দক্ষতা-কলা-কৌশলে রাজ-রাজাদের মন জয় করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। আর এই ভালোলাগার দৌলতে বা অন্য কোনও কারণে উচ্চপদস্থ ও খ্যাতি সম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা ক্ষমতাগুণে প্রচুর সম্পত্তির মালিকও হন। বাগচী পরিবারের সম্পত্তির হদিস জমশেরপুর এলাকার বাইরেও পাওয়া যায়। বাগচী জমিদার পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য-বিশেষ সমৃদ্ধশালী এবং এলাকায় আলোচ্য পরিবারের প্রভাব অসামান্য। পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর এই পরিবার আঞ্চলিক ইতিহাস সৃজনে সজীব ভূমিকা নিতে পারে। প্রাবন্ধিকের বর্ণনায় – উক্ত পরিবারের আট শতাব্দীর প্রাচীনতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ-রাজাদের সাথে উক্ত পরিবারের সংযোগ সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া এলাকার অন্যান্য জমিদারদের সাথে বাগচী জমিদারের সংযোগ সূত্র সন্ধান পাওয়া যায়। একদিকে পারিবারিক শ্রী, অপরদিকে রাজন্য বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্র – বাগচী পরিবারকে বনেদি পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করেছে। বর্তমান কালেও সেই ধারা বহমান। আজও এলাকার মানুষ-জন বাগচী বাড়ির বড়ো পূজা (দূর্গা) দেখতে ছুটে যায়। শহরবাসী ও শহরচারী বাগচী পরিজনেরাও ঐ ক'দিন আপন পল্লী ভিটেতেই অবস্থান নেন। গ্রামীন সুধারস পান করেন। রক্তের শোণিত ধারায় পল্লী মুখীনতা আজো বিরাজমান। জানিনা কয়েক পুরুষ পরে কি হবে?

৩.১.২ চৌধুরী জমিদার পরিবার : ধোঁড়াদহ বহুপ্রাচীন গ্রাম। জলঙ্গী (জলাঙ্গী) নদীর তীরস্থ। চৌধুরী বংশধরেরা এই গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমিদার। পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবদের সংযোগ সূত্র রয়েছে। পরিবারের পূর্বপুরুষেরা নবাবী তহশীলদার ছিলেন। চৌধুরীদের একটা প্রাচীন মন্দির রয়েছে এবং তাদের গৃহাভ্যন্তরে একটি 'পাতাল ঘর'ও আছে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৮)। চোর-ডাকাত-বর্গীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এমন প্রয়াস। উক্ত পাতাল ঘরের 'কড়ির গায়ে ৯১৭ শকাব্দ লিখিত আছে'। আজ আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণ-সৃজনে এই ধরনের উপাদান প্রাণরস যোগান দেয়। এই কিছু দিন আগেই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এমনই এক ধরনের গুপ্ত ঘরের সন্ধান মেলে (এই সময় পত্রিকা: ০৬.০১.২০১৬)। এলাকার এক আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক চন্দন বসুর মতে (এই সময় পত্রিকা: ০৬.০১.২০১৬):

> 'সম্ভবত গুপ্ত ঘর এটি। আগেকার দিনে দস্যুদের হাত থেকে সংসারের দামী জিনিসপত্র বা সম্পত্তি বাঁচাতে অনেকে মাটির নীচে গোপনে ঘর তৈরি করতেন সে সব লুকিয়ে রাখার জন্য।'

–অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি প্রাচীন কালে চোর-ডাকাতদের উপদ্রপ থেকে বাঁচতে এবং বাঁচাতে অনেক স্থানে এমন ধরনের ভূগর্ভে গুপ্ত ঘরের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়েও হয়তো এমন ধরনের সজীব ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান আমরা পাবো, যা আঞ্চলিক তথা জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থনে সহযোগিতা করবে।

৩.১.৩ সরকার জমিদার পরিবার : কায়স্থ বংশের সরকার বাবুরা সুন্দলপুর এলাকার একটি প্রাচীন জমিদার বংশ। দান-ধ্যান, অতিথিসেবায় এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এঁদের নিজেদের নীলকুঠিও ছিল। এই পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক বলয়ও গড়ে উঠেছিল। এই পরিবার 'জগন্নাথ দেবের গুঞ্জবাটীর অনুকরনে গুঞ্জবাটী নামে একটি উদ্যান প্রস্তুত করেন' (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৮)। সেখানে তুলসী বিহারী নামে এক মেলাও হতো। জমিদার বাটীতে

বেশ ধুম ধামের সঙ্গে দোল যাত্রাও হতো। দান-ধ্যান, অতিথিসেবা, পূজার্চনা, দোল যাত্রা- বহুতর উৎসবাদি লেগেই থাকতো এলাকায়। আর এগুলির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঐ সরকার জমিদার পরিবার।

সরকার পরিবারের শ্যাম সুন্দর সরকার এলাকায় বেশ খ্যাতিবান লোক ছিলেন। পরিবারের অধিকাংশ সম্পত্তিই দান করে দেন। দান-ধ্যান ছিল সরকার পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য। এছাড়া আরবপুরের স্যান্যাল বাবুরা প্রাচীন জমিদার বংশ। এই পরিবারের সাথে বাগচী জমিদার পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে অনুমান করা হয়। আরবপুরের ভয়ানক জল কষ্ট নিবারণে বাগচী বাবুরা এগিয়ে আসেন। যতীন্দ্রমোহনের লেখায় তেমনটায় জানা যায় (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৯)। এছাড়া শিকারপুর এলাকায় নীলকার্য বন্ধ হবার কারণে নীলকর সাহেবরায় জমিদারী ভাগজোত আদায় করে। আর এই সাহেবী চালে গ্রামখানি বেশ শ্রীশালী হয়ে উঠেছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জমিদার পরিবারগুলি স্ব স্ব এলাকায় বিশেষত্বের দাবিদার। আপন ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা অগ্রণী। পারিবারিক ঐতিহ্যের গুণে ভর করে, বহমান কালেও সে ঐশ্বর্যকে আজও তারা কেবল বহন করে চলছেন তা নয়, ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তাঁরাই। আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণেতারা তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন। বাস্তবে কিন্তু তেমনটা হয়নি। মৌখিক ইতিহাসেও (Oral History) গ্রামীণ প্রবীণদের মুখে মুখে শোনা যায় এই জমিদার বর্গের নাম। শোষণের শোষক যন্ত্র তাদের হাতে থাকলেও, সেই 'আইডেন্টিটি'ই তাঁদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। এই জমিদার পরিবার-পরিজনের অনেকেরই একটা একটা করে মানবিক মুখ ও গুণ ছিল — যার বলে বলীয়ান হয়ে আজো গ্রামীণ ইতিহাসে এদের ঐতিহ্যকথা প্রচারিত হয়।

৩.২ 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধে ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা: আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিন্ন পাঠ: ইতিহাস ও ভূগোল আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ, ভূগোল ছাড়া ইতিহাস অস্তিত্বহীন। ইতিহাস চর্চার সূত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভূগোল সংক্রান্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্যবাহী। অন্যদিকে ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জানতে এবং তার ধারা বুঝতে ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর একটি উক্তি (চৌধুরী, ২০০৮: ৬২) স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

> "..... কোনো অঞ্চলের ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক পর্বে ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এদেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রায় অবহেলিত বলা যায়।"

- এখানে ব্যতিক্রমী হিসাবে উল্লেখ করা যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কথা। তিনি পল্লীর ইতিহাস রচনায় হাত পাকাতে গিয়ে 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধে তদ্‌অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা ভূগোল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তার বর্ণনায় এলাকার ভৌগোলিক সীমা, মৃত্তিকার প্রকৃতি, কৃষিকাজের বর্ণনা, নদ-নদী কথা, জন-জাতির পরিচয় ইত্যাদির বর্ণনা খুব স্পষ্ট ভাবেই ধরা রয়েছে। কৃষিকাজের বর্ণনা, জন-জাতির পরিচয়, মৃত্তিকা, প্রকৃতি-পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচ্য প্রবন্ধে পৃথকভাবে উল্লেখিত। এই পর্বে কেবলমাত্র আমরা ভৌগোলিক সীমা, নদ-নদী নিয়ে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'পল্লী-কথা'য় নদীয়ার করিমপুর এবং তদ্‌সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সূত্রে মেহেরপুর (অধুনা বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্ত) থানার অধীনস্ত করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোড়াঁদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর নামক গ্রামগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সীমানা, গ্রামের পরিবেশ বর্ণনা, এলাকায় নদ-নদীর প্রভাব এবং তাদের গতিপথ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়। উদ্ধৃতিযোগ্য কয়েকটি বর্ণনাংশ তুলে ধরা হলো:

> ১. "পদ্মানদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ন্তগত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধোড়াঁদহ, মোক্তারপুর, গোঘাটা,

ত্রিহট্ট, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৮)

২. "নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাদের বিশেষ উপযোগী ছিল। … পূর্ব্বোল্লিখিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে চাষীদিগের প্রথম বসবাসের কারণ।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৮)

৩. "অধুনা এ প্রদেশে কৃষি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা। প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, বন্যাও প্রায় আসে না, বিল খাল বা বৃহৎ জলাশয় ও নালারও একান্ত অভাব; … সময়ে বৃষ্টি হয় না, বা অতিবর্ষণ হয়, সে বৎসর 'অজন্মা' হওয়াতে দেশে 'অকাল' লাগে।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১০)

৪. "শিকারপুর হাউলিয়া নদীতীরস্থ এই গ্রামখানি আয়তনে বড়ো, ক্ষুদ্র নহে।… হাউলিয়া পদ্মার একটি শাখানদী, বর্ষাকালে জল বাড়িয়া উভয় তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত পলিমাটি পড়ে। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'দিয়াড়' বলে।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৭)

৫. "পূর্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে ফৌজ লইয়া গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড়ো বড়ো স্টীমার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া বহুস্থানে যাইত।" (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৮)

এমন বেশ কিছু উদ্ধৃতি এখনও চয়ন করা যেতে পারে, যেখানে করিমপুর এবং সন্নিহিত এলাকার ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যাবে। এই আলোচনা থেকে যে দিকগুলি প্রতীয়মান হয়, তা হল:

- প্রাবন্ধিক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। না হলে কারোও পক্ষে এমন ক্ষুরধার একটি মুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চলের তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।
- বিষয়নিষ্ঠ অধ্যয়ন ও ক্ষেত্রসমীক্ষা — এই দুইয়ের সামঞ্জস্য এবং এলাকা সম্পর্কে সচেতনতা বোধের প্রকাশ ঘটেছে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখনীতে।
- ইতিহাসবোধ সচেতনতার পাশাপাশি প্রাবন্ধিকের ভূগোল বোধও যথেষ্ট। কোন নদীর কোথায় উৎপত্তি, কোথায় তার শেষ, শাখা নদী পরিচয়, নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির নামোল্লেখ, অঞ্চলে নদীর প্রভাব — ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য ও বর্ণনা প্রাবন্ধিকের ভূগোল সম্পর্কে বোধান্বয়নের মাত্রাকে সূচিত করেছে।

৩.৩ আঞ্চলিক ইতিহাস উৎস সন্ধানে বর্ণভিত্তিক আলোচনা: যতীন্দ্রমোহন বাগচী যে সময়ে 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন তখনও 'বঙ্গ-সংহার' হয়নি। তবে বঙ্গ-সংহারের বীজ বপন করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। সুসংহত সমাজ ও সংস্কৃতিকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে জাতিভিত্তিক বা বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ধারণা। 'বর্ণ' নেতিবাচক অর্থ বহন করলেও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজ সংগঠনে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'বর্ণ' পূর্বে যে অর্থ বহন করতো, বর্তমানে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কখনো বা সংস্কৃতিগত, আবার কখনোবা পেশা বা কর্মভিত্তিক রূপে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্ণ বা জাতি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার তাত্ত্বিক বোধান্বয়নে স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে বর্ণতাত্ত্বিক আলোচনা বিশেষত্ত্বের দাবিদার। সমাজ সাংগঠনিক দৃষ্টিকোন থেকে উপরিউক্ত বিষয়টির ওপরে আলোকপাত করা হবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে 'জাতিভেদ প্রথা' অন্যতম অভিশাপ। সবধর্মের লোকদের মধ্যে তা দৃশ্যমান। যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধের সূত্রে 'জাতিভেদ প্রথা' প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে হয় হিন্দু ধর্মের কথা। মুসলমানদের মধ্যেও এমনটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজে তা অধিকতর রূপ নিয়েছিল এবং তা আজও নেতিবাচক দৃষ্টিতেই পরিত্যজ্য। যতীন্দ্রমোহন বাগচী স্থানীয় ধর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯-১১০):

> "হিন্দুর মধ্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শূদ্রজাতীয় চন্ডাল গণ্ডক ও কন্নি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়।... কন্নি জাতি সাধারণতঃ সূত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে। চণ্ডালেরা পান বিক্রয় ...।"

— মুসলমানদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯):

> "মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। ফরাজি বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান কাপড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে না। তাহারাই একটু বেশি পরিমাণে মুসলমানভাবাপন্ন।"

বিভিন্ন সময় মুসলিম সমাজবেত্তাগণ দাবি করেন — মুসলমানদের মধ্যে কোনও জাতিগত ভেদাভেদ নাই। এই জাতিগত বা বর্ণগত ভেদা-ভেদের বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায় — ধর্মীয় বা দৈনন্দিন আচার ও ব্যবহারিক জীবনে অল্পবিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়টি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর চোখ এড়িয়ে যায়নি। উদ্ধৃতাংশে ফরাজি মুসলমানের কথা প্রসঙ্গে তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

৩.৪ প্রাচীনতম নামোল্লেখ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্ণন : জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে যে কোনও ধরনের ইতিহাস সৃজনে বিবেচ্য এলাকার প্রাচীনতম স্থান নাম, ব্যক্তি নামের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। কেননা সেই সকল বিশেষ স্থান বা ব্যক্তিকে ঘিরে প্রচলিত থাকে নানান ধরনের জনশ্রুতি, যা ইতিহাস সৃজনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। তাছাড়া স্থানীয় এলাকার সমাজ-সংস্কৃতিতে এমন কিছু ব্যক্তি-পরিবার থাকেন, যাঁরা ঐতিহ্য-গরিমায় বৈভবপূর্ণ হয়ে নিজেরাই ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী বর্ণিত এলাকার বৈশিষ্ট্য কৃষি-নির্ভরতা হলেও; ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্তরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে, যা গ্রামীণ-পল্লী সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট চিহ্ন। বেশ কয়েকটি স্থানের মন্দির, মসজিদের নামোল্লেখ রয়েছে। 'নীলকুঠির কথা', 'পাতালঘর' প্রাচীন কালের বিনিময় মাধ্যম কড়ি প্রসঙ্গ, ঐতিহ্যশালী জমিদারদের কথা এবং তাদের পরিবারের খ্যাতিবান ব্যক্তিত্বদের প্রসঙ্গও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে।

স্থান নাম: গোঘাটা, ত্রিহট্ট, গোয়াড়ী, রাইটা, আখ্‌রি গঞ্জের আঁধার কোটা, Gregson পুর, Berry নগর।

নদী নাম: সাহিত্য খ্যাত নদী Meander, ভৈরব, হাওলা, মাথাভাঙ্গা বা চূর্নী, জলঙ্গী (জলাঙ্গী), 'বিশিঙ্গাদহ'(দীঘি) 'ছোট বাবুর দহ', যশোবাবুর দহ (দীঘি), পদ্মার শাখা নদী হাউলিয়া ইত্যাদি।

বিশেষ স্থান: মেহেরপুরের 'মুন্সেফী চৌকী', কুচিডাঙ্গায় (কেঁচুয়াডাঙ্গা) নবাবী ফৌজের অবস্থান, সুন্দলপুরে জগন্নাথ দেবের গুহাবাটী অনুকরণে গুহাবাটী উদ্যান এবং 'তুলসী বিহারী' মেলা, আরবপুরের সংস্কৃত ভাষাচর্চা কেন্দ্র, চতুষ্পাঠী।

ব্যক্তি নাম: ধোঁড়াদহ নিবাসী রামেশ্বর সাহা (একজন সঙ্গীতশিল্পী, উল্লেখ্য আড়তদার)। মুর্শিদাবাদ জেলার নসিপুর রাজা, বাগচী পরিবারে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব: রামগঙ্গা, সর্বানন্দ বাগচী, বীরসিংহ সুবেদার, বাহীরবন্দ পরগনার মহারানী স্বর্ণময়ী, সুন্দলপুর বাসী শ্যামসুন্দর সরকার।

প্রাচীন জমিদার বংশ: ধোঁড়াদহের চৌধুরী জমিদার বংশ, যমশেরপুরের বাগচী জমিদার বংশ, সুন্দলপুরের সরকাররা কায়স্থ বংশীয় জমিদার।

উজ্জ্বল প্রত্ন-সম্পদ: ধোঁড়াদহের চৌধুরী জমিদারদের মন্দির, ও সুন্দলপুরের মন্দির, শান্তিরামপুর গ্রামের গির্জা, চোঙাপাড়া ও দোগাছির মসজিদ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উজ্জ্বল প্রত্ন সম্পদের নিদর্শন। এছাড়া ধোঁড়াদহ চৌধুরী জমিদারদের একটি পাতালঘর আছে, সেই ঘরের কড়ির গায়ে ৯১৭ শকাব্দ লেখা আছে, যা প্রত্ন প্রাপ্ত উজ্জ্বল উপকরণ। এছাড়া এতদ্ অঞ্চলের প্রত্ন সম্পদের অন্যান্য নিদর্শন হল কতিপয় নীল কুঠি। এই নীল কুঠিগুলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে অনেক জনশ্রুতি। তার সাথে মিশে রয়েছে অনেক সাব-অল্টার্নদের বিড়ম্বিত জীবনালেখ্য। নীল আবাদের সুবিধার্থে শিকারপুর, আধার কোটা, বর্তমান হোগল বেড়িয়া, আরবপুর, মামুদ্গাড়ি বা জিৎপুর, চেঁচানে, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর, তারাপুর প্রভৃতি স্থানে নীল কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটসন কোম্পানীর লোকের লালসার তাড়নায় যে শোষকযন্ত্রগুলি গড়ে তুলেছিল — সেই ধরনের ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন আজও গ্রামে গঞ্জে খোঁজ নিলেই পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে:

- আলোচ্য পল্লী অঞ্চলটি গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট চিহ্ন বহন করছে।
- প্রত্ন-প্রাপ্ত উপকরণগুলি উজ্জ্বল প্রত্ন-সম্পদের দাবীদার। এ-সবের দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের আঞ্চলিক ইতিহাস সংকলন করা যাবে।
- এলাকায় প্রচলিত জনশ্রুতি, জনকথার বিশ্বাস যোগ্য সহযোগী প্রামান্য নিদর্শন হিসেবে, প্রাপ্ত উপাদান সমূহ বিশেষত্বের দাবিদার।
- আঞ্চলিক চরিত্র (Local Charecter), আঞ্চলিক পরিবেশ-পরিস্থিতিগত (Local Context)-পাঠ (Text) জানতে উক্ত উপাদান সমূহের অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন, যা দেশজ সংস্কৃতির (Indigenous Culture) সারবত্তা বা রেণুকে উপস্থাপন করে।

৩.৫ যতীন্দ্রমোহন বাগচী কলমে স্থানীয় ধর্মপাঠ (Local Religious Text): স্বকীয় সংস্কৃতির আঁধার: প্রাচীন কালের ইতিহাস মাত্রই ধর্মকথা। ধর্মের মোড়কে মোড়া ইতিহাস। কখনো বর্ণনার সূত্রে ইতিহাস, কখনো বা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সূত্রে বর্ণিত ইতিহাস। যতীন্দ্রমোহন বাগচী গ্রামীণ কথা বর্ণনার সূত্রেই ইতিহাসের কথা বলেছেন, যা একাধারে সাহিত্য পদবাচ্য ও ইতিহাসের উপাদান। প্রবন্ধাকারে বর্ণিত, এ যেন সাহিত্যের মোড়কে ইতিহাস রস আস্বাদন।

বৃহত্তর করিমপুর এলাকায় সর্বধর্ম সহাবস্থান পূর্বেও ছিল, এখনও তা বর্তমান। এই অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সহজ সদ্ভাব দেখা যায়। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য থেকে জানা যায় (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯):

> "হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দূর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর ন্যায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয়না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে, ঐ পূজা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রসাদ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্ব্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা ও অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পূজার সময় তাহারা দপ্তর কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু ও মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে।"

— অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এলাকায় সর্বধর্ম সহাবস্থানের একটা পরিসর (Space) ছিল। মিলেমিশে ধর্মাচার পালনে কোনও চোখরাঙানি সেখানে কাজ করেনি। এলাকাবাসীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ লক্ষিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর পরস্পরের মধ্য থেকে সাংস্কৃতিক নির্যাস-টুকু নিয়ে নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তুলেছে, যা একদম ভিন্ন ধরনের। সেই অর্থে না হিন্দু, না মুসলমান। একদম বাঙালি ভাব-ভাবনা সমৃদ্ধ নব সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ। ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে আমরা যাকে বলতে পারি নবপর্বের ধর্ম পাঠ (New Configuration of Regional Religious Text)। আন্তঃধর্মীয় পাঠের ক্ষেত্রেও (Inter Religious Text) যতীন্দ্রমোহন বাগচী চিন্তা-চেতনা আরোও বেশি গভীরতর। তাঁর মতে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯) — এলাকায় 'মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান।' অন্যদিকে — 'হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শূদ্রজাতীয় চণ্ডাল গণ্ডক ও কন্নি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়।' — স্থানীয় ধর্ম বিভিন্নতার সূত্র ধরে ধর্ম ভেদে জীবিকারও ক্ষেত্রভেদ হতে পারে, তা আমরা জানতে পারি। যেমন: কান্নি জাতি সাধারণত সূত্রধর, চণ্ডালের পেশা পান বিক্রয়, চুন প্রস্তুত, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কাজ, গণ্ডকরা চিড়া কুটেন ইত্যাদি বৈচিত্র্যময়ী পেশার কথা জানা যায়।

এছাড়াও প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন — এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মালম্বী, খ্রীষ্টান ধর্মী, 'কর্তাভজা' ধর্ম সম্প্রদায়ের কথাও জানা যায়। তথাকথিত নিম্নবর্তীয় জনসমাজকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ইতিহাস আমরা প্রায় সকলেই জানি। এই এলাকাতেও ধর্মান্তরকরণ ঘটেছিল, তবে নিতান্তই কম। প্রাবন্ধিকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় — 'কর্তাভজা' নামে এক লোক ধর্মসম্প্রদায় রয়েছে এই এলাকায়। এরা মূলত গোয়ালা জাতি। এদের মধ্যে কোনও জাতিভেদ প্রথা নাই। ধর্মকথা বর্ণনে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ব্রাহ্মণদের প্রতি দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ ইতিবৃত্ত নির্মাণ কালে তিনি যে গ্রাম বা পল্লীগুলির বর্ণনা করেছেন, সেখানে একাধিক জাতিগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও, কখনো কখনো তিনি ব্রাহ্মণদের কথা বেশি করে বলেছেন। যেমন শিকারপুরের কথায় ধরা যাক। ব্রাহ্মণ উপস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন, তেমনি ধোঁড়াদহেও একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা তুলে ধরেছেন (চৌধুরী জমিদার বংশ)। এঁদের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। খুবই ঐতিহ্যাশ্রয়ী মন্দিরটি। পূর্বেই চৌধুরী পরিবারের পাতালঘর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দলপুরেও মৈত্র ও বাগ আখ্যাধারী ব্রাহ্মণদের ঐশ্বর্যের কথাও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কলমে ধরা পড়েছে। বহু প্রাচীন গ্রাম আরবপুরেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি। তাদের হাত ধরেই সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চার কথা জানা যায়। বেশ কয়েকটি চতুষ্পাঠীর কথাও জানা যায়। খ্যাতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা দূর-দূরান্তের পণ্ডিত সভায় আমন্ত্রণ পেতেন। সমকালে সেই ধারা লুপ্ত হয়। উত্তরাধীকার বংশধরেরা পরবর্তীতে কুসঙ্গে পড়ে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে পারেনি। শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রগুলি লুপ্ত পায়।

৩.৬ গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও কৃষীকাজের বর্ণনা: স্থানীয় ইতিহাস নির্মাণে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জন-গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং কৃষিকাজ অন্বিত জীবনাচরণ — উক্ত এলাকার অঞ্চলগত পরিচয়কে প্রকটিত করে। গ্রামীণ মানুষের বৈচিত্র্যময়ী জীবন-যাপন প্রণালী, তাদের পেশাগত প্রকারভেদ, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা জীবন ধারণের ভিত্তি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন বাগচী সাহিত্যে জীবন-জীবিকা প্রণালী বিশেষভাবে সমাদর পেয়েছে। স্থান পেয়েছে কৃষিকাজের সুবিধা-অসুবিধা, তদ্‌সংক্রান্ত গৃহীত কর্মপন্থা। মৃত্তিকার রূপ বৈচিত্র্যানুযায়ী চাষের ধরনের রকমফেরের কথাও তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধের আলোচনায় এসেছে।

বাংলা নদীবহুল দেশ। এই নদীবহুলতাই বৃহত্তর করিমপুর এলাকায় চাষিগণের বসবাসের কারণ। কৃষক এবং ভদ্রলোক নিয়েই এই প্রদেশ গড়ে উঠেছে এবং কৃষককুলের অধিকাংশই মুসলমান জাতীয় — প্রাবন্ধিক এমনটায় উল্লেখ করেছেন। লেখকের ধারণা (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৮): 'সম্ভবতঃ এই উৎসাহশীল পরিশ্রমী মুসলমান কৃষকগণই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী।' হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ছাড়া শূদ্রজাতীয় চণ্ডাল, গণ্ডক ও কন্নি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাত দেখা যায়। এরা বিচিত্র ধরনের জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে থাকে।

চণ্ডালেরা পান বিক্রয় ও চুন প্রস্তুত করে, রাজমিস্ত্রী, ছুতোরের কাজ করে। গণ্ডকরা মুদির দোকান দেয় এবং চিড়ে প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করে। এলাকাতে এখনও পান চাষের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তবে এখন তা কেবল জাতি ভিত্তিক নয়। দাস, বর্গীরা (অধীকারী) ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে পান চাষের প্রচলন ও বিকাশ ঘটেছে।
জলবায়ুর পরিবর্তন-জনিত কারণে বর্তমানে কৃষিকার্যের বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১০):

> "প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, বন্যাও প্রায় আসে না, বিল খাল বা বৃহৎ জলাশয় ও নালারও একান্ত অভাব; জমি রাঢ়-দেশের মতো আঠাল নহে বা উত্তর অঞ্চলের মতো স্যাঁতা নহে; পরন্তু দোআঁশ বা বেলে (বালি), সুতরাং জল ধারণ ও রক্ষণপক্ষে অনুপযোগী।"

—এই কারণেই হৈমন্তিক ধানের চাষ হয় না। আউশ ধানের চলন বেশি। রবিশস্যের মধ্যে মুগ চাষ শ্রেষ্ঠ। আনন্দপুরী মুগের বেশ নাম ডাক। এছাড়া চর প্রদেশে কলাই-এর চাষেরও প্রচলন রয়েছে। কৃষকদের পারঙ্গমতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১০):

> ".....কৃষক কুলনিতান্ত অশিক্ষিত এবং অলস প্রকৃতি হওয়াতে দিন দিন আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। সামান্য চেষ্টাতে এদেশের বেলে মাটীতে আলু, পটল প্রভৃতি তরি তরকারী জন্মাতে পারে, সে চেষ্টাও তাহারা করে না।"

—একজন কৃষি বিশেষজ্ঞের মতই লেখক চাষবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামত এখানে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্যে এলাকায় কৃষিকাজের সংকট ও সম্ভাবনার দিকটি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি ধরা পড়েছে কৃষিকাজ-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার কথা, প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের প্রাচুর্যতার কথা। কৃষিজ নির্ভর জমিদারী উৎপীড়ন ব্যবস্থাও ধরা পড়েছে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে হল (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১০): 'যে বৎসরে সময়ে বৃষ্টি হয় না, বা অতিবর্ষণ হয়, সে বৎসর 'অজন্মা' হওয়াতে দেশে 'অকাল' লাগে। জমিদারের খাজনা বাকি পড়ে, প্রজা নির্মূল হয়।' - চাষনির্ভর সমাজে এমন ধরনের ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক। যে বছর ফসল ভালো হয়, সে বছরের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। কারণ হিসাবে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১০):

> "কারণ 'অজন্মা'র বৎসরে দরিদ্র চাষী জমিদার বা মহাজনের স্থানীয় গোলা হইতে ভোজ্না ধান দেড়া এবং বীজ ধান দুনা কড়ারে লইয়া থাকে; সুবৎসর তাহা পরিশোধ করিতে গিয়া সুবৎসরও দুর্বৎসর হইয়া উঠে।"

-জমিদারী শোষণের অন্তরালে নিম্নবর্গীয় বা প্রান্তিক জনগোষ্টীর বিড়ম্বিত জীবনালেখ্য বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। হতঃদরিদ্রের সেই কণ্ঠস্বরকে যতীন্দ্রমোহন স্বল্প কয়েকটি কথায় তুলে ধরেছেন। যেখানে কৃষককুলের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনই বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস আলোচনায় এমন ধরনের ভাগ্য-বিপর্যস্ত কৃষকের কথা আরও বেশি করে প্রাধান্য পেলে ভালো হত। সেদিক থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রতি আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণেতাদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পল্লী জীবনের প্রাণ-রসে ভরপুর চাষাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে এমন ভাবগম্ভীর বিষয়নিষ্ঠ আলোচনা বাংলা সাহিত্য তথা আঞ্চলিক ইতিহাস বিনির্মাণে অন্যন্যতার দাবীদার।

৩.৭ ঐতিহ্যাশ্রয়ী পূজা-পাল-পার্বণ, স্থানীয় উৎসবাদি এবং মেলার বর্ণনা: স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের (Local Cultural History) অনন্য পাঠ: সর্বধর্ম সমন্বয়ী সাংস্কৃতিক পাঠ নেবার পক্ষে আলোচ্য এলাকা অন্যন্যতার দৃষ্টান্তবাহী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই এলাকায় সবরকম ধর্মের লোকের বসবাস রয়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরের উৎসব পাল-পার্বণ অংশগ্রহণ করে পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে। এই সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯):

> "স্বভাবতঃই এই প্রদেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়; ...অন্যান্য দেশের মতন ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উৎসবাদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় লাঠালাঠি নাই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দূর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর ন্যায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে।"

- সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলোচ্য এলাকা কেবলমাত্র সর্বধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত নয়, সাংস্কৃতিক সমন্বয়েরও দৃষ্টান্ত। তিনি আরোও উল্লেখ করেছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১০৯):

> "মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে, ঐ পূজা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রসাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়।"

— অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সহিত সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণও ঘটেছে। বর্তমানের সাপেক্ষে এমন ধরনের উচ্চভাব জাত সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বাংলা তথা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময়ী সংস্কৃতিকে মনে করায়। হাল কালের উত্তপ্তময় সাংঘাতিক যে পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত - এমনটা দাবি করায় যায়। সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের আরোও অনেক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে উক্ত এলাকায়। যেমন-

- মুসলমান গৃহে হিন্দু পরব ষষ্ঠী পূজা ও অম্বুবচী পূজা করা হয়।
- সরস্বতী পূজায় মুসলমান ভাইয়েরা সরস্বতী চরণে দপ্তর-কাগজপত্র অর্পণ করে।
- মুসলমানের একদিলের গানে হিন্দু ভাইয়েরা আমন্ত্রিত হন।
- 'বেহূলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে'।

হিন্দু পুজা পার্বণের মধ্যে দূর্গোৎসব প্রধান। এছাড়া কালীপূজা, লক্ষীপূজা, সরস্বতী পূজা, শিব পূজা, কার্তিক পূজা, চড়ক, দোল ও রথযাত্রা প্রচলিত। এলাকায় একাধিক লোক উৎসবের প্রচলন রয়েছে। যেমন: 'ঠক্ঠকে','বুলান', 'পূণ্যপুকুর', 'সাবিত্রী ব্রত', 'বনভোজন' উৎসব ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
ঠক্ঠকে এক ধরনের লোকউৎসব। ফাল্গুন মাসের শেষ তিন দিন অনুষ্ঠিত হয়। ওলাবিবি বা ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রীকে সন্তুষ্ঠ রাখার তাগিদে পল্লী রমণীগণ এমন ধরনের উৎসবের আয়োজন করেন। সদ্য নির্মিত মাটির তৈরি পুতুল এবং প্রদীপ নিয়ে তা ষষ্ঠী তলার নির্দিষ্ট স্থানে বৃক্ষের মূলে স্থাপন করা হয়। এরপর সেখানে প্রদীপগুলি জ্বেলে রেখে দলবদ্ধভাবে রমণীগণ গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন। প্রাবন্ধিক সুন্দরভাবে বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৩):

> "ঐ সময়ে পল্লী-বালকেরা কলার বাস্না, ছতর বা শুষ্ক পত্রের আটির সহিত কঞ্চি বাঁধিয়া অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে। সকলের হাতেই হস্তপরিমিত শুষ্ক সজিনা বা পাল্তে মাদারের দুইটি করিয়া প্রজ্জ্বলিত ঠক্ঠকে নামক কাষ্ঠ থাকে; তাহারা তাহাই ঠুকিয়া অগ্নিক্রীড়া করে।"

রমণীগণ ঘরে ফেরার সময় ওলা বিবির ছড়া আবৃত্তি করেন। ঐ ছড়াতে ওলাকে আপন দেশ ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবার মিনতি সহ সকরুন প্রার্থনা করা হয়। এছাড়াও করিমপুর এলাকায় 'বুলান' নামে আরেক প্রকার উৎসবের প্রচলন আছে বলে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন, যদিও বর্তমানে এই লোক আঙ্গিকটির প্রচলন নেই। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র-সংক্রান্তির সময়। চণ্ডালরা এই উৎসবের প্রধান আয়োজক। নয়নাভিরাম সাজে সজ্জিত হয়ে

আয়োজনকারীরা নৃত্য সহযোগে কৃষি বিষয়ক ছড়া-গীত ঘরে ঘরে গেয়ে বেড়ায়। তিন দিন ধরে নৃত্যগীতে পল্লী গৃহগুলি আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বৈশাখ মাসে 'পুণ্যপুকুর' নামেও উক্ত এলাকায় একটি উৎসবের প্রচলন রয়েছে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৩)। এটি মূলত বালিকাদের মধ্যে প্রচলিত। বাড়ির উঠানে ছোট পুকুর কেটে তার পার্শ্বে মাটির পুতুল এবং ফুল সাজিয়ে প্রত্যহ 'পূর্বাহ্নে' পূজা করে। পূজার সময় বিভিন্ন ধরনের ছড়া আবৃত্তি করে। এই বালিকাগণই আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত 'যম পুকুর' নামে একটি উৎসব পালন করেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৪)। এই উৎসব চলাকালীনও ছড়া কাটা হয়।

গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাবিত্রী ব্রত সহ অনেকগুলি ব্রতের চল রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ্য মাসে গৃহিনীরা পল্লীগ্রামে সমবেত হয়ে 'বনভোজনে'র উৎসব আয়োজন করে থাকেন (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৪)। এই উৎসবটি মূলত ভোজন সংক্রান্ত। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু সকলের মধুর মিলনে উৎসবটি মনোজ্ঞ রূপ পায়।

এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে রোগ-ব্যাধী দূরীকরণের আশায় 'ছাগ বধ প্রথা', পীরের সিন্নিদান প্রথারও প্রচলন রয়েছে (বাগচী, ১৩১২ সন: ১১৪)। তাছাড়াও সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে সুতিকাগৃহ বাঁধাবাঁধি প্রথার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কালে গৃহ প্রাঙ্গণে ছোটো ধরনের 'রামকুঁড়ে' নির্মাণ করে তা সুতিকা গৃহ রূপে ব্যবহার করা হয়। ঝড় বৃষ্টি যাই হোক না কেন, সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে সদ্যপ্রসূত মা দশ দিন সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হন। অনেক সময় তা শিশু সন্তান সহ মায়ের জীবনে নেতিবাচক ফল বহন করে।

৪. সাহিত্য চর্চার আঁধারে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ব্যতিক্রমী আঞ্চলিক ইতিহাস-পাঠ: 'পল্লী-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংস্কৃতি-পাঠ ইতিহাস চিন্তা-চেতনার সঙ্গে যুক্ত। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে অখণ্ডীয় বঙ্গসংস্কৃতির কথা বলেছেন। বস্তুতঃ প্রাবন্ধিক বৃহত্তর করিমপুর এলাকার কথা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকাটি ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধশালী। প্রাবন্ধিক এলাকার বিভিন্ন জমিদার পরিবারের প্রেক্ষিতে ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বাগচী পরিবার, চৌধুরী জমিদার পরিবার ও সরকার জমিদার পরিবারকে বেছে নিয়েছেন। এলাকায় এই পরিবার সমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই সাথে পরিবারের ঐতিহ্য কথা, সমাজে তাঁদের অবদান এবং বংশগত কৌলিন্যের কথা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ইতিহাস-চর্চায় ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা। নদ-নদী, খাল-বিল, প্রকৃতি কথা, এলাকা পরিচিতি ইত্যাদি দিক যথাযথভাবে ধরা পড়েছে তাঁর আলোচনায়। সমাজে 'বর্ণ' ধারণা ব্যপকভাবে স্বীকৃত ছিল, সেইসাথে বর্ণভিত্তিক কর্ম-পেশাও সমাজে বিদ্যমান ছিল। প্রাবন্ধিক বর্ণভেদে পেশা পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস উৎসসন্ধানে বর্ণভিত্তিক আলোচনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী বৃহত্তর করিমপুর এলাকার বিভিন্ন প্রাচীনতম স্থানের নামোল্লেখ করেছেন এবং সেইসব স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও ঐ এলাকার গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও কৃষীকাজের বর্ণনা এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী পূজা-পাল-পার্বণ সানুপঙ্খ বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি তাঁর 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধ থেকে। স্থানীয় উৎসবাদি এবং মেলার বর্ণনাও বাদ পড়েনি তাঁর ভাবনা থেকে।

সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পাশা-পাশি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই উপস্থাপনা ভাব নিরপেক্ষ। বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধের পাঠবিশ্লেষণ শেষে আমরা দাবি করতে পারি — প্রাবন্ধিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়বাদী ভাবনা কর্তৃক প্রভাবিত। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ সদ্ভাব প্রসূত সমন্বয়ী চিন্তা-ভাবনাকে প্রাবন্ধিক লালন করেছেন। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত, এককথায় বলা যায় সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যবোধ (Communal Harmony) সদা জাগ্রত ছিল- সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করলেই এমন পারদর্শীতা ও পারঙ্গমতা

দেখানো সম্ভব। বর্ণিতব্য ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অনেক উপাদান আজ হারিয়ে গেছে বা লুপ্তপ্রায়। গ্রাম্যসংস্কৃতিকে অধুনা শহুরী ভাবনা অনেকাংশে গ্রাস করেছে, গ্রামীণ জীবনকে নগরকেন্দ্রিক জীবন ক্রমান্বয়ে গ্রাস করেছে। ফলে প্রবন্ধে বর্ণীতব্য উপাদানের অনেক কিছুই ক্ষয়িষ্ণু। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'একদিল পীরের গানের' কথা। এই শিল্পাঙ্গিক ও শিল্পীদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, আঙ্গিকটি লুপ্তপ্রায়। গ্রামের প্রবীণদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যমসেরপুর সন্নিকট বাশবেড়িয়া গ্রামে কয়েক-জন শিল্পী রয়েছেন। পরিশেষে বলাযায় সাংস্কৃতিক স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসাবে প্রাবন্ধিক ব্যবহার করেছেন - জনগণের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, উৎসব-পাল-পার্বণ-মেলা, কৃষিজ অর্থনীতি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বর্ণভিত্তিক পেশাজীবি সম্প্রদায়ের কথা - এককথায় আচরণীয় জীবনের নানাবিধ দিক। অসাধারণ নৈপুণ্যে পল্লী-স্পন্দনকে উপস্থাপন করেছেন সাহিত্যের প্রেক্ষিতে, যা আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবেও বিবেচিত। তাছাড়া ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সাহিত্যিক উপাদান হিসাবেও মর্যাদা পেতে পারে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

৫. উপসংহার: যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বড় পরিচয় তিনি একজন কবি। রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বর্তমান। এক সময় বাঙালির প্রামাণ্য ইতিহাস নাই বলে তাঁকে আফশোস করতেও দেখা গেছে। সমসময়ে স্বজাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রচারের একটা উদ্দীপনা লক্ষ্য করার মতো। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় আহ্বান করে লেখা নিয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা প্রকাশও করা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'পল্লী-কথা' প্রবন্ধটি ঠিক এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক কিনা তার বিতর্কে না ঢুকেও বলা যায়, কালনুক্রমিক ইতিহাস চর্চায় এর তাৎপর্য কোন অংশে কম নয়। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদের (বাগচী, ১৯৮৭: ১৫৯) পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পাঠ করেন এবং সাহিত্য পরিষদের ছাত্রদের ও অন্যান্যদের কি ধরনের কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করতে হবে তার দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধ। সেখানে একপ্রকার স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ইতিবৃত্ত রচনার কাঠামো বা 'মডেল' শ্রোতামণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন। তাঁর এই প্রবন্ধ সাহিত্যের পাঠকের পাশাপাশি, ইতিহাসের পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয় হতে পারে। একজন সাহিত্যিকের হাতে গ্রামীণ ঐতিহ্য-ঐশ্বর্য্য রূপের অসাধারণ বর্ণনা সত্যই মনোমনহরকর। আঞ্চলিক ইতিহাসের সবল কাঠামো তিনি দান করেছেন। এই অঞ্চল নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ হয়নি, বিস্তৃতভাবে আলোকপাতও হয়নি। আমাদের অনুমান এই অঞ্চলের ওপর তাঁর এই লেখায় প্রথম ও প্রামাণ্য নিদর্শন। সেদিক থেকে বিচার করলে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর এই নিরলস কর্মপ্রয়াস বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার।

তথ্যসূত্র:

ঘোষ, জ্যোতির্ময়, ১৯৮৭, যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী (সঃ), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মুদ্রিত।
চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, ২০০৮, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী, নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, মুদ্রিত।
বাগচী, যতীন্দ্রমোহন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, *পল্লী-কথা*, কলিকাতা: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মুদ্রিত।
'এই সময়' দৈনিক পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ২০১৬, ই. মাধ্যম।

গ্রন্থপঞ্জি:

ঘোষ, জ্যোতির্ময় (সম্পাঃ), ১৯৮৭, যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী: ২য় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মুদ্রিত।
চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, ২০০৮, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী, নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, মুদ্রিত।
তরফদার, মমতাজুর রহমান, ২০১১, ইতিহাসের দর্শন, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মুদ্রিত।
বাগচী, যতীন্দ্রমোহন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, *পল্লী-কথা*, কলিকাতা: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মুদ্রিত।
শাহনাওয়াজ, এ কে এম, মো. আদনান আরিফ সালিম, ২০১৬, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, ঢাকা: প্রতীক, মুদ্রিত।

সাহা, অশোক কুমার (সম্পাঃ), ২০১২, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রদ্ধাঞ্জলী সংখ্যা, সবুজের পত্রিকা, করিমপুর, মুদ্রিত।

সেন, সুকুমার, ২০০৬, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস:চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা:আনন্দ প্রকাশনী, মুদ্রিত।

সিংহরায়, গোরা (সম্পাঃ), ২০০৬, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা: ভারবি প্রকাশনী, মুদ্রিত।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, মিজান রহমান, ২০১৬, বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তা (সঃ), ঢাকা: কথাপ্রকাশ, মুদ্রিত।

পত্রিকা:

'এই সময়' দৈনিক পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ২০১৬।